KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 02, Issue :01, (January - June) 2025
Published On 28th March 2025

স্বাধীনতাত্তোর পর্বে সাঁওতাল সমাজ উন্নয়নে নারী ও তাদের ক্ষমতায়নঃ প্রসঙ্গ বাঁকুড়া জেলা

সঞ্জয় দাস
পি. এইচ. ডি. গবেষক
ইতিহাস বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল,

সারাংশ:

ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও ভারতে বেশিরভাগ স্থানে নারীরা সেই অধিকার পায় না। ভারতীয় নারীদের সমানাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যেমন- কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের সমান বেতন না পাওয়া, দৈনন্দিন কাজের সামাজিক মর্যাদা না পাওয়া, অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা প্রভৃতি। ভারতে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সমাজে এই লিঙ্গ বৈষম্যের হার আরও বেশি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পুরুষদের সমান পরিশ্রমী হয়েও আদিবাসী মহিলারা যেমন একদিকে শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত, তেমনই আবার তারা তাদের কর্মের যথাযথ মর্যাদা পায়না। তাই ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। এই আদিবাসী সমাজ অধিকাংশ অত্যন্ত দরিদ্র, অনগ্রসর এবং প্রান্তীয়। দেশের প্রাচীনতম অধিবাসী হয়েও তারা আজও তথাকথিত সভ্য নাগরিক সমাজ থেকে দূরে বসবাস করে এবং যুগ যুগান্তর ধরে বঞ্চিত ও শোষিত। দেশের অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মত সাঁওতাল নারীরাও আজ নানা আগ্রাসনের শিকার। একদিকে যেমন তাদের ভূমি, ভাষা, সম্পদ প্রভৃতির উপর আক্রমন চালানো হচ্ছে, অন্যদিকে আবার শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে তাদের জীবন থেকে নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা সবই হারিয়ে যেতে বসেছে। পুরুষেরা সামাজিক-সাংস্কৃতিকগত এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে কিছুটা মানিয়ে নিতে পারলেও, নারীদের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার ফলে তারা মর্যাদাহীন জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ তারাই যুগ যুগ ধরে আদিবাসী সমাজের মূল কাঠামো রক্ষার্থে জীবনপাত করে আসছে। সাঁওতালদের বিদ্রোহ চলাকালীন তারা যেমন পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তেমনি তাদের চিরাচরিত পারিবারিক মূল কাঠামোটিকে ধরে রাখতে ঘরে বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই তারা কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে।

সূচক শব্দ :- আদিবাসী, সাঁওতাল, সমানাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, সমাজ উন্নয়ন, বাঁকুড়া

ভূমিকা: -

‘If you educate a man, you educate an individual, however, if you educate a woman, you educate a whole family. Women empowered means mother India empowered’

- জওহরলাল নেহেরু

বর্তমান পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ভাগ নারী হলেও ভারতের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে নারীর সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় কম। এমনকি ভারতীয় সমাজে তাদের সামাজিক মর্যাদা সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের সমান না। পশ্চিমের দেশগুলিতে নারীরা পুরুষদের সমান অধিকার এবং প্রতিপত্তি ভোগ করে। কিন্তু স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও ভারতের বেশির ভাগ স্থানে নারীরা সেই সুযোগ পায় না। ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকারের কথা বললেও ভারতীয় নারীদের সমানাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের সমান বেতন না পাওয়া, দৈনন্দিনের কাজের সামাজিক মর্যাদা না পাওয়া, অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা প্রভৃতি। ভারতে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সমাজে এই লিঙ্গ বৈষম্যের হার আরও বেশি। পুরুষদের সমান পরিশ্রমী হয়েও এই সমাজে মহিলারা যেমন একদিকে শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত তেমনই আবার তারা তাদের কর্মের যথাযথ মর্যাদা পায়না। তাই ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তাদের অংশ গ্রহণ পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। এই আদিবাসী সমাজ অধিকাংশ অত্যন্ত দরিদ্র, অনগ্রসর এবং প্রান্তীয়। দেশের প্রাচীনতম অধিবাসী হয়েও তারা আজও তথাকথিত সভ্য নাগরিক সমাজ থেকে দূরে বসবাস করে এবং যুগ যুগান্তর ধরে তারা বঞ্চিত ও শোষিত। এই রূপ সমাজে নারীর অবস্থা যে আরও সঙ্গীন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দেশের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মত সাঁওতাল নারীরাও নানা আগ্রাসনের শিকার। একদিকে যেমন তাদের ভূমি, ভাষা, সম্পদ প্রভৃতির উপর আক্রমন চালানো হচ্ছে, অন্যদিকে আবার শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে তাদের জীবন থেকে নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, গান সবই হারিয়ে যেতে বসেছে। পুরুষেরা সামাজিক সাংস্কৃতিকগত এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে কিছুটা মানিয়ে নিতে পারলেও, নারীদের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা ও শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ফলে তারা মর্যাদাহীন জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ তারাই যুগ যুগ ধরে আদিবাসী সমাজের মূল কাঠামো রক্ষার্থে জীবনপাত করে আসছে। সাঁওতালদের বিদ্রোহ চলাকালীন তারা যেমন পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তেমনি তাদের চিরাচরিত পারিবারিক মূল কাঠামোটিকে ধরে রাখতে ঘরে বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই তারা কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। তবে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নের গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় সমাজে নারীদের যে সামগ্রিক চিত্র পরিবর্তিত হচ্ছে, তার থেকে বাদ পরেনি আদিবাসী নারীরাও। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পের আওতায় এদের জীবনযাত্রার মান খানিকটা হলেও পরিবর্তিত হয়েছে, যার একটি বাস্তবিক চিত্র দেখতে পাই পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাৎপদ একটি জেলা বাঁকুড়ার মধ্যে। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাগুলি কাটিয়ে উঠে এই জেলার নারীরা সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছে, তাদের কাজের সামাজিক স্বীকৃতি মিলছে সর্বোপরি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের নানা দিক তাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে। নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে লিপ্ত এই অঞ্চলের সাঁওতাল নারীরা কীভাবে ধীরে ধীরে ক্ষমতায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে, তা এই বৈজ্ঞানিক সমীক্ষাভিত্তিক গবেষনাধর্মী লেখনীর মাধ্যমে খোঁজার চেষ্টা করবো।

গবেষণাক্ষেত্রের পরিচিতি: - রাঢ় বাংলার মূল ভূখণ্ড যেই সমস্ত অঞ্চল নিয়ে গঠিত, তাদের মধ্যে অন্যতম হল বাঁকুড়া জেলা। প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থান ও শুষ্ক জলবায়ুর কারণে এই জেলা সূচনাকাল থেকেই একটি পশ্চাৎপদ জেলা রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রাচীনকাল থেকেই এই জেলা ছিল একাধিক জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল। সুদূর অতীতে উত্তর ভারত থেকে আগত অষ্ট্রিক ভাষা-ভাষী 'আদি-অষ্ট্রাল' বা 'প্রোটো-অস্ট্রেলীয়' নরগোষ্ঠী যে নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিল, সাঁওতাল, কোড়া, মাহালি প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় হল তারই উত্তরসূরি। পরবর্তীকালে এর সাথে মিশেছে দক্ষিণ ভারতের নর্মদা উপত্যকা অঞ্চল থেকে আসা দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর ভূমিজ, মাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীগুলি। বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন আদিবাসীর অবস্থান রয়েছে, যাদের বেশিরভাগ আজও পৃথিবীর সভ্য সমাজ থেকে দূরে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে চলেছে।

এই পৃথক অবস্থানের জন্য তারা যেমন মানব জীবনের নানা মৌলিক অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত তেমনি তাদের এক দুর্বিষহ মানসিক ও শারীরিক অস্বাস্থ্যের মধ্যে দিয়ে দিন জীবনযাপন করতে হয়। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির এই বিপুল পরিসংখ্যার বিচারে আফ্রিকার পরেই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি আদিবাসী গোষ্ঠীর বসবাস আমাদের এই ভারতবর্ষেই। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতে প্রায় ১০৪ মিলিয়ন আদিবাসীর বাস, যারা মোট ৭০৫টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং ভারতীয় মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ।[i] সুতরাং ভারতবর্ষের মোট আদিবাসী জনসংখ্যা ফ্রান্স বা ব্রিটেনের মত দেশের মোট জনসংখ্যার থেকেও বেশি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এখানে মোট ৪০টি আদিবাসী গোষ্ঠীর বসবাস এবং তা মোট জনসংখ্যার ৫.৮ শতাংশ।[ii] জেলায় মোট জনসংখ্যার নিরিখে বাঁকুড়ায় আদিবাসী সংখ্যা ১১.৫০ শতাংশ।[iii] সুতরাং জেলার এক-দশমাংশের বেশি মানুষ আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত। পরিসংখ্যানের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম ও সবচেয়ে অগ্রসর আদিবাসী হল সাঁওতালরা। বাঁকুড়া জেলায়ও আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যা বেশি হলেও এখানে সাঁওতাল ছাড়াও ভূমিজ, খেড়িয়া প্রভৃতি জনজাতি গোষ্ঠীগুলি বসবাস করে। বর্তমান প্রবন্ধে বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত ব্লক 'রাইপুর' ব্লকের একাধিক গ্রামের আদিবাসীদের উপর এই বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষা করা হয়েছে। এই অঞ্চলটিকে 'গবেষণা ক্ষেত্র' নির্বাচন করার একাধিক কারণ রয়েছে। যেমন- প্রথমত, জেলার মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশের বেশি হল আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং তার সিংহভাগ আদিবাসী হল সাঁওতাল। দ্বিতীয়ত, এটি শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া একটি জেলা, যেখানে নারী উন্নয়নের একাধিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সুতরাং নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিকূল বৈশিষ্ট্যগুলি খুব সহজেই এই গবেষণা কর্মের মধ্যে দিয়ে উঠে আসবে। আবার এই অঞ্চলের প্রধান ও বৃহৎ আদিবাসীগোষ্ঠী যেহেতু সাঁওতালরা, তাই এই সমাজের ক্ষমতায়নের নানা দিক উন্মোচিত হবার সুযোগ ও সম্ভাবনা তাদেরই সর্বাধিক।

আদিবাসী কারা:- সাধারন ভাবে আমরা 'আদিবাসী' বলতে বুঝি এমন এক আদিম জনগোষ্ঠী, যারা সভ্য সমাজ থেকে দূরে মূলত জঙ্গলে বসবাস করে, যাদের নির্দিষ্ট কিছু জীবনযাপনের অভ্যাস রয়েছে, যেমন- নিজস্ব আচার-আচরণ, নিজস্ব নিত্যভঙ্গী, শিকার-প্রবণতা, জঙ্গলে স্বল্প চাষাবাদকারী, বন-জঙ্গলের খাবারের উপরই অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা, প্রকৃতির সাথে মেলবন্ধন তথা মাটির মানুষ। তবে আদিবাসী কারা? তাদের বৈশিষ্ট্য কী? প্রভৃতি নিয়ে পণ্ডিত তথা গবেষকদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। যেমন ড: রিভার্স আদিবাসী সম্পর্কে বলেছেন– 'তারা সমাজের এমন একটি গোষ্ঠী যাদের জীবনে জটিলতা নেই, যারা এখনও একই ভাষা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে, যাদের আকৃতি বা সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য আছে, নিজেদের নিয়ম-কানুন রক্ষার জন্য যাদের পঞ্চায়েত আছে এবং প্রয়োজন হলে যারা গোষ্ঠী সচেতন মনোবৃত্ত নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ বা সংগ্রাম করে থাকে'।[iv] আবার পিডিংটন সাহেব এদের সম্পর্কে বলেছেন–'তারা এমন এক গোষ্ঠীর মানুষ যারা একই ভাষায় কথা বলে, একই অঞ্চলে বসবাস করে এবং যাদের সংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য (Homogeneity) বিদ্যমান'।[v] অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেছেন- 'আদিবাসী সমাজ হল কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি অথবা এক গোষ্ঠীর পরিবার, যাদের নামের সমতা থাকে, সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং একই রূপ বিবাহভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক ধর্মীয় বাধা নিষেধ মেনে চলে এবং নিজেদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা, সামঞ্জস্য ও আদান প্রদান করে থাকে'।[vi] ১৯৬২ সালে শিলং-এ ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী নেতৃবৃন্দ এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে আদিবাসী সম্পর্কিত এক সর্বসম্মত সংজ্ঞা নির্ণয়ে সচেষ্ট হন। তাদের সম্মিলিত সংজ্ঞা এইরূপ- আদিবাসী বলতে তাদেরকেই বোঝায় যারা সকলেই সমপ্রকৃতির, স্বতন্ত্র ভাষাভাষী, নিরক্ষর ও প্রযুক্তি বিদ্যায় পশ্চাৎপদ, যারা একই বংশ জাত বলে দাবি করে এবং জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে যে সব প্রথা আবহমান ধরে চলে আসছে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেই সব প্রথার প্রতি আনুগত্য প্রর্দশন করে।[vii] সাংবিধানিক সূত্রে 'আদিবাসী' বলতে মূলত তপসিলি জনজাতি গোষ্ঠীগুলিকেই বুঝিয়ে থাকে। ভারতের স্বাধীনতার পর সংবিধান রচনাকালে (১৯৫০খ্রিঃ) এদের

সাংবিধানিক স্বীকৃত দেওয়া হয়েছিল। এই সালের ৩৪২নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের যে সাতটি আদিবাসী গোষ্ঠী তপসিলি তালিকাভুক্ত ছিল তারা হল- সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাও, লেপচা, ভুটিয়া, মেচ এবং ম্রু।[viii] তবে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে 'Backward classes commission' এর সুপারিশ অনুযায়ী 'The Scheduled caste and Scheduled tribes order act' এর সংশোধনীতে রাজ্যের আরও ২২টি আদিবাসী গোষ্ঠীকে তপসিলি ভুক্ত করা হয়।[ix] পরে বিহারের যে সব অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত করা হয় সেই সব অঞ্চলের আদিবাসীদেরও এই তালিকাভুক্ত করা হয়।

সাঁওতালদের সাধারন পরিচিতি :- এই আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে অগ্রসর ও বৃহত্তম জাতি হল সাঁওতালরা, এদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বর্ননা দিতে গিয়ে চারুলাল মুখোপাধ্যায় তার 'The Santals' গ্রন্থে লিখেছেন- 'Santal, a man of medium size but muscular and strong, with a completion varying from light-brown to an ebony colour, almost beardless and his ox-eyed, merry women-folk. The physical features that distinguish them from rest of the population are that they have a round outline and look rather stout'।[x] 'সাঁওতাল' শব্দটি ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকেই ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ভাবে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কাছে সাঁওতাল নামে পরিচিত হলেও তারা নিজেদের 'হড়' বলতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এই হড় কথার অর্থ 'মানুষ'।[xi] সাঁওতাল পুরান সংগ্রাহক স্ক্রেফসরুড সাহেব এর মতে, 'সাঁওতাল' শব্দটি সম্ভবত 'সাওনতার' শব্দের অপভ্রংশ এবং দীর্ঘদিন এ দেশে কয়েক পুরুষ বসবাসের ফলে তারা এই নামটি গ্রহন করেছে।[xii] আবার ভাষাচার্য সুনীতি কুমারের মতে 'সামন্তপাল' (সৈন্যদল) শব্দ থেকেই সাঁওতাল শব্দটি এসেছে।[xiii] সামন্তপালের অর্থ সীমান্ত রক্ষক। তবে তিনশো বছর আগে এই সাঁওতাল নামক বিশেষ জাতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মধ্য যুগে ছোট-বড় রাজারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের সময় কোল গোষ্ঠীর একটি দলকে শুধু তীর নিক্ষেপ ও যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের পারদর্শিতার জন্য নিযুক্ত করত, এই দলের নাম ছিল সাঁওতাল।[xiv] তাই প্রাচীন যুগ বা মধ্যযুগের কোন সাহিত্যে সাঁওতালদের কথা জানা যায় না। সম্ভবত তখন তার 'খেরওয়াড়' বা 'হড়' নামে পরিচিত ছিল। ২০১১ সালের জনগননা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালদের সংখ্যা মোট ২৫,১২,৩৩১ জন।[xv] বর্তমান গবেষণাক্ষেত্র বাঁকুড়া ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বর্ধমান, প্রভৃতি জেলায়; পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে এমনকি ভারতের বাইরে নেপাল, বাংলাদেশ ও সাঁওতালদের জনবসতি রয়েছে।

সমাজ উন্নয়নে সাঁওতাল নারীদের অবদান :- সমাজ উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হল তার অর্থনৈতিক অবস্থা ও শিক্ষার উন্নয়ন। কিন্তু বাঁকুড়ার 'রাইপুর' ব্লকের সাঁওতালদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থাও যেই রূপ, পাশাপাশি শিক্ষার হারও তাদের মধ্যে অনেক কম। এর মূল কারণগুলি হল- এখানের বেশিরভাগ মানুষের পারিবারিক আয় খুব কম। এই কম আয়ের উপর নির্ভর করে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাছাড়া এখানে অধিকাংশ মানুষই কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজাল এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এছাড়াও পিতামাতার শিক্ষার প্রতি অনীহা, উপযুক্ত আদিবাসী সাঁওতাল শিক্ষকের অভাব, মাতৃভাষা সাঁওতালি হলেও শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ও ইংরেজি, অপর্যাপ্ত আদিবাসী বিদ্যালয় সর্বোপরি বিদ্যালয়গুলি আদিবাসী সাঁওতাল গ্রাম থেকে অনেক দূরে অবস্থিত প্রভৃতি বিষয়গুলি এই অঞ্চলের সাঁওতালদের শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ। সুতরাং যেই সমাজে শিশুদের শিক্ষাগ্রহণেই এত প্রতিবন্ধকতা, সেই সমাজে নারী উন্নয়ন যে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নিম্নে এই অঞ্চলের সাঁওতাল নারীদের দৈনন্দিন কার্যাবলীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণিত হল-

সামাজিক কতৃত্ব:- সাঁওতাল পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের সামাজিক সম্মান প্রতিষ্ঠিত তাদের কর্মের উপর অর্থাৎ সমাজ উন্নয়নে তারা কোন কাজের সাথে যুক্ত তার উপর। সম্পত্তিতে অধিকারহীনতা তাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে কন্যা বা স্ত্রীর অধিকারের কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় কেবল পুত্ররাই। তবে পিতার কোন পুত্রসন্তান না থাকলে, তখন কন্যাসন্তান সম্পত্তির মালিকানা পায়। যদিও তার সংখ্যা খুব নগন্য। আবার কোনো বিধবা সাঁওতাল রমণী তার মৃত স্বামীর সম্পত্তির জীবনস্বত্ব লাভ করে মাত্র, তা বিক্রি করার অধিকার পায় না। যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, স্বামীর সম্পদ ভোগ করতে পারবেন শুধু। এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সাঁওতাল নারী স্বামীর থেকে কোন সম্পত্তি লাভ করবে না।[xvi] এটাই সাঁওতাল সমাজের প্রচলিত রীতি।

পরিবার ও বিবাহ:- সাঁওতাল সমাজে অন্তঃপুরে সাঁওতাল স্ত্রী'রা অনেকটা স্বাধীন, তবে সেটা নির্ভর করে কেমন পরিবারে তার বিবাহ হয়েছে। যদি যৌথ পরিবার হয়, তাহলে জ্যেষ্ঠ বউ অধিক ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের অধিকারিণী হয়। সাধারনভাবে সাঁওতাল পুরুষেরা একক বিবাহই করে, তবে একাধিক বিবাহতে তাদের কোনো সামাজিক নিষেধাজ্ঞা নেই। পুরুষ নারী উভয়রেই বিবাহ বিচ্ছেদের সমান স্বাধীনতা আছে। পুরুষদের মত নারীরাও ইচ্ছা করলে বিবাহ বিচ্ছেদ করে পছন্দের সঙ্গীর সাথে সংসার করতে পারে। তাদের একা বাইরে কাজে যেতে, অন্য পুরুষের সাথে কথা বলতে সামাজিক কোনো বাঁধা নেই। সুতরাং সমাজ ও পরিবারের স্ব স্ব জায়গায় তারা কিছুটা হলেও স্বাধীনতা ভোগ করে। উল্লেখ্য, পুরুষদের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিবাহ করলে স্ত্রীকে নিয়ে নিকটবর্তী কোনো স্থানে নতুন বাড়ি তৈরি করে তাকে বসবাস করতে হয়। তবে কনিষ্ঠ পুত্র স্ত্রী সহযোগে পিতামাতার সাথে বসবাস করতে পারে।[xvii] সাঁওতাল সমাজে বিবাহ কালে কন্যাপণ দেবার রীতি রয়েছে।[xviii] তবে বরপক্ষ নামমাত্রই কন্যাপণ নামক যৌতুক দেয়। অনেক ক্ষেত্রে বর ঘরজামাই হিসেবেও বসবাস করে। তবে এই ব্লকে এখনও বাল্য বিবাহের রমরমা দেখা যায়।

খাদ্য সংগ্রহ ও উপার্জনকারী:- সাঁওতাল সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী-পুরুষ সমানভাবে কাজ করে। তবে কাজের ক্ষেত্র তাদের পৃথক হয়। পূর্বে জঙ্গলে বসবাসকারী সাঁওতাল নারীরা জঙ্গল থেকে খাবার সংগ্রহের কাজে অধিক নিযুক্ত ছিল। পুরুষরা কেবল শিকার করতে যেত। তবে পরবর্তীকালে বাসস্থান ও খাদ্যের প্রকৃতি পরিবর্তনের সাথে সাথে পূর্ববস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক অন্নুনয়ন ও বাইরে কাজের পরিসর বৃদ্ধির ফলে এই অঞ্চলের সাঁওতাল নারীরা তাদের বাঁধাধরা কর্মক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। পুরুষদের পাশাপাশি জমির আল কাটার কাজ নারীরাও করছে বর্তমানে, যেই কাজ পূর্বে কেবল পুরুষরাই করত।[xix] এছাড়া কাজের জন্য তারা নিজের এলাকার বাইরে গিয়েও উপার্জন করছে। দৈনিক শ্রমিকের কাজ থেকে শুরু করে অ-আদিবাসী বাড়িতে ভৃত্যের কাজেও তারা সমানভাবে নিযুক্ত হয়েছে। আবার অনেক রমণী থেকে বৃদ্ধা নিকটবর্তী হাটে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন ফল, শাক-সবজি, তেল, হাঁস-মুরগীর ডিম, সাবান, তামাক, হাঁড়িয়া প্রভৃতি বিক্রি করেও পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনছে। সুতরাং এই দিক থেকে বলা যায় একজন সাঁওতাল নারী অনেক ক্ষেত্রে একজন সাঁওতাল পুরুষের থেকেও অধিক পরিশ্রম করছে। ঘরের কাজ হোক আর বাইরের সমস্ত ধরনের প্রয়োজনীয় কাজেই তাকে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে।

চাষাবাদ:- মাঠের কাজেও এই অঞ্চলের সাঁওতাল নারীরা পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে। বাড়ির বউ থেকে বালিকা কন্যা সবাই এই কাজের সাথে যুক্ত থাকে। পুরুষরা যেখানে পতিত জমি উদ্ধার, জমি পরিষ্কার ও লাঙল দেওয়া প্রভৃতি কাজগুলি করে। নারীরা তেমন বীজ বোনা থেকে ফসল কাটা বিভিন্ন কাজ তারা করে থাকে। এমনকি সারা বছরের জন্য খাদ্য ও বীজ সংরক্ষন করাও তাদের কাজের মধ্যে পড়ে। পরের মরশুমে এই বীজ থেকেই আবার চাষবাসের কাজ করা হয়। এছাড়াও এই সাঁওতাল রমণীরা সারা বছর বিভিন্ন ধরনের

শুকনো ফল ও গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে রাখে।[xx] গ্রীষ্মকালে বা খরার সময় তাদের তা বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। সুতরাং দেখা যায় সাঁওতাল সমাজে নারী–পুরুষের কর্ম বিভাজন তাদেরকে স্ব স্ব জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে তাদের মধ্যে যে স্পষ্ট শ্রম বিভাজন রয়েছে, তা লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে গড়ে উঠেছে। আর এই লিঙ্গ বৈষম্যের প্রধান কারণ হল প্রাকৃতিক ও জৈবিক কর্মক্ষমতার পার্থক্যের জন্য।

গৃহস্থালি ও অন্যান্য কাজ:- এই অঞ্চলের সাঁওতাল নারীরা সর্বাগ্রে গৃহস্থালির সমস্ত কাজ সম্পাদনা করে। যেমন- ঘর-বাড়ি পরিষ্কার, শিশু পালন ও তার দেখাশোনা, রান্না করা, শিশুদের পড়ানো, গবাধি পশুপালন, জ্বালানী সংগ্রহ, রেশন সংগ্রহ, গৃহস্থালির খরচের হিসাব রাখা এছাড়াও মা হিসেবে সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। এই সমস্ত কাজের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা পুরুষদের কোনো সহযোগিতা পায় না। সুতরাং ঘরে বাইরে উভয় জায়গায় তারা সমানভাবে কাজ করে গেলেও সেই কাজের সামাজিক মর্যাদা তারা পায় না। তাদেরকে সর্বদা দুর্বল হিসেবেই দেখা হয়। পুরুষরা তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী ঘরের কোনও কাজই করে না। অধিকাংশ পুরুষ দিনে পরিশ্রমের কাজ করতে ও রাতে নেশাভাঙ করতেই অভ্যস্ত। তবে এর পাশাপাশি বধূ নির্যাতনের ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। এই তো গেল গৃহস্থের কথা, বাইরেও নারীদের অবস্থা পুরুষদের সমতুল্য নয়। এর সব থেকে বড় উদাহরণ দেখা যায় কাজের দৈনিক মজুরির ক্ষেত্রে। শুধু সাঁওতাল সমাজ নয়, সমগ্র আদিবাসী সমাজেই মজুরির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য দেখা যায়। এর কারণ হিসেবে বলা হয় নারীরা পুরুষদের তুলনায় কর্মঠ কম হয়। এই অঞ্চলের সাঁওতাল সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। এক পরিসংখ্যায় দেখা গেছে এই অঞ্চলের সাঁওতাল পুরুষেরা যেই কাজে ১০০ টাকা পায়, সেই একই কাজে সাঁওতাল নারীরা পায় ৬০ থেকে ৮০ টাকা। যদিও তাদের কাজের ক্ষেত্রে তেমন কোনও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় না। এক্ষেত্রে অনেক প্রতিবাদ উঠলেও তার কোনো সুরাহা আজ পর্যন্ত হয়নি। উপরন্তু বাইরে কাজে তারা নানারকম হয়রানি ও বঞ্চনার শিকার হয়। নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে তাদের দৈনিক কাজকর্ম করতে বাইরের এলাকায় যেতে হয়। তবুও সামান্য উপার্জনের আশায় তারা এই কাজ করে চলেছে। তবে তারা এই উপার্জন কেবল পরিবারের জন্যই করে না, নিজেদের সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষার জন্যও করে। উল্লেখ্য, এই উপার্জিত অর্থ খরচের ক্ষেত্রে সাঁওতাল নারীরা খানিকটা স্বাধীনতা ভোগ করে। এই কার্যে পুরুষেরা সরাসরি কোনো হস্তক্ষেপ করে না। নারীরা তাদের উপার্জিত অর্থ সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়ের পাশাপাশি নিজের জন্যও খরচ করতে পারে। পুরুষদের মত তারাও নেশাভাঙ করার জন্য সামান্য কিছু খরচ করে। এক্ষেত্রে পুরুষদের কাছে তাদের কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। অনেকক্ষেত্রে আবার নারী-পুরুষের একইসাথে নেশাভাঙে মত্ত হবার উদাহরণও চোখে পরে।

শিক্ষা :- এইরুপ বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া নারীদের কাছে শিক্ষাই যে একমাত্র হাতিয়ার, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে দুঃখের বিষয় হল সেক্ষেত্রেও তারা বঞ্চিত। শিক্ষাই হল জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষা ছাড়া কোনও জাতিরই উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু সেই ক্ষেত্রেই এই আদিবাসী তথা সাঁওতাল নারীরা অনেক পিছিয়ে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ব্লকের সাঁওতাল নারীদের পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল বাল্যবিবাহ। সংবিধান স্বীকৃত বিবাহের বয়স তারা মানে না। অধিকাংশ পরিবারের মেয়েদের বাল্যবিবাহই ঘটে। এছাড়া দারিদ্রতা এই অঞ্চলের নারীদের শিক্ষাগ্রহণের আরেকটি প্রধান বাঁধা। দরিদ্র হবার কারণে বাড়ির মেয়েরা অল্প বয়স থেকেই উৎপাদনমুখী কাজে বা মাঠের কাজে নিযুক্ত হয়। ফলে তাদের আর বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ হয়ে ওঠে না। পারিবারিক মানসিকতাও এদের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার একটি কারণ বলে গণ্য করা যায়। কারণ দেখা যায় পিতা-মাতা মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের লেখাপড়ার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। এমনকি দেখা যায় অনেক পরিবার ছেলেদের পড়াশুনার জন্য অর্থ সঞ্চয় করে, সেখানে মেয়েদের ক্ষেত্রে ঔদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। এর প্রধান কারণ হল পিতা মাতার ধারণা হল যেহেতু বিবাহের পর মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে, তাদের আর দেখাশুনা করবে না।[xxi]

এছাড়া ভাষাগত সমস্যা ও বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের অধিক দূরত্ব, পরিকাঠামোর অভাব ইত্যাদি নানা কারণে অনেক মেয়েদের বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তবে বর্তমানে পরিস্থিতির খানিকটা পরিবর্তন ঘটেছে। সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অর্ন্তভুক্তিকরন পূর্বের তুলনায় কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি তরফে শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য ও মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলায় বর্তমানে অনেক মেয়েরাই বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার করে কলেজে পড়াশুনা করছে। ভবিষ্যতে তাদের উন্নয়নের পথ আরও প্রশস্ত হবে বলে আশা করা যায়।

উপসংহার: - সুতরাং শিক্ষা ও আর্থিক উন্নয়নের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল সমাজের যে সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে, তা এই সমাজের নারীদের ক্ষমতায়নের পথকে যে প্রশস্ত করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যায় আমাদের সংবিধান রচনাকালেই (১৯৫০খ্রিঃ), যেখানে কর্মক্ষেত্রের পাশাপাশি রাজনীতিতেও নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা হয়। ১৯৯২ খ্রিঃ ৭৩ নং সংবিধান সংশোধনের দ্বারা পঞ্চায়েতের সকল পদে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ পদ সংরক্ষণের কথা বলা হয়।[xxii] এছাড়াও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় পঞ্চায়েতে আদিবাসীদের এবং পাশাপাশি আদিবাসী নারীদের পদ বিশেষভাবে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত পদক্ষেপ প্রান্তিক তথা আদিবাসী নারীদের ক্ষমতায়নের পথকে প্রশস্ত করেছে। বাঁকুড়ার রাইপুর ব্লকের মত এই প্রান্তীয় ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের নারীদের রাজনৈতিক সচেতনতা চোখে পড়ার মত। তারা একদিকে যেমন সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যাবলী, মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ করছে, তেমনি আবার গোষ্ঠীবদ্ধভাবে ভোট দিতে যাচ্ছে সর্বোপরি নিজেরা পঞ্চায়েত ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করছে।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি এই ব্লকের সাঁওতাল নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতাও পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাগুলি (NGO) আদিবাসী মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি প্রকল্পের মধ্যে NREGA (National Rural Employment Guarantee Act) এর অন্তর্ভুক্ত একশো দিনের কাজে বহু সাঁওতাল নারীরা পঞ্চায়তের শ্রমিক রূপে কাজ করে নিজেদের আর্থিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তবে রাইপুরের মত বাঁকুড়ার একাধিক ব্লকগুলিতে সাঁওতাল নারীদের সামগ্রিক উন্নয়নে বিভিন্ন স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলি (SHG) গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক রূপে কাজ করে চলেছে। NABARD (The National Bank for Agriculture and Rural Development) এর মত সংস্থাগুলি এই স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে অর্থনৈতিক সহায়তা দান করছে। পুরুষদের তুলনায় এই গোষ্ঠীগুলিতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তিই বেশি। রাইপুর ব্লকের প্রতিটি গ্রামেই এইরূপ একাধিক স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী কাজ করে চলেছে। উল্লেখ্য যে, এই স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সহায়তা দানই করে না, বাইরের জগৎ সম্পর্কেও তাদের পরিচয় ঘটায়। মহিলা ও শিশুর নানারকম সমস্যা নিয়েও তারা সচেতনতা গড়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি গোষ্ঠীগুলিই এই অঞ্চলের নারীদের ক্ষমতায়নের অনুপ্রেরনার প্রধান উৎস। কারণ এইসব স্ব-নির্ভর প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক শাখাগুলির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি তাদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হয়, যা তাদের পরবর্তীকালে সাংবিধানিক ক্ষমতা লাভের পথকে অনুপ্রানিত করে। সুতরাং এইরূপ পিছিয়ে পড়া নারীজাতির উন্নয়ন থেকে ক্ষমতায়ন- সামগ্রিকতার জন্য বিভিন্ন সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও নাগরিক সমাজের দায়িত্বের পাশাপাশি এই সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলির এর কার্যকলাপ বৃদ্ধিও একান্ত প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

[i] https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/scheduled-tribes-in-india-as-revealed-in-census-2011 , Accessed 3rd March, 2025.

[ii] https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/43018, Accessed 3rd March, 2025.

[iii] *District Statistical Handbook*, 2011, Bankura, Department of Planning & Statistics, Government of West Bengal, P. 49.

[iv] রায়, হিমাংশুমোহন, *ভারতের আদিবাসী*, মণ্ডল অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, মহালয়া, ১৩৮৭, পৃ- ২।

[v] তদেব, পৃ- ৩।

[vi] বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ*, প্রথম খন্ড, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৮, পৃ- ১-২।

[vii] মণ্ডল, অমল কুমার, *ভারতীয় আদিবাসী*, দেশ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২২, পৃ- ২৩।

[viii] https://www.constitutionofindia.net/articles/article-342-scheduled-tribes-2/, Accessed 9th March, 2025.

[ix] THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES' ORDERS (AMENDMENT) ACT, 1956, Act no. 63, P- 888-889.

[x] Mukherjee, Charulal. *The Santals*. A. Mukherjee & Co. Pvt. Ltd., Calcutta, 1939, P- 49.

[xi] Rishley, H.H. *Tribes and Castes of Bengal*. Vol (II), Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1892, P- 224.

[xii] বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৮৬।

[xiii] তদেব, পৃ- ১৮৬।

[xiv] ভৌমিক, সুহৃদ কুমার, *আদিবাসীদের ভাষা ও বাঙলা*, মারাং বুরু প্রেস, মেদিনীপুর, ১৯৯৯, পৃ-১৬-১৭।

[xv] https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/42898, Accessed 9th March, 2025.

[xvi] সাক্ষাৎকার। লক্ষ্মী কিস্কু, বয়স ৪৫ বছর, পেশা- গৃহবধূ, গ্রাম- কামারদিহা, ব্লক- রাইপুর, জেলা- বাঁকুড়া, ১৮.১০.২০২৪

[xvii] সাক্ষাৎকার। যুগল সোরেন, বয়স ৫০ বছর, পেশা- কৃষক, গ্রাম- জাম্বানী, ব্লক- রাইপুর, জেলা- বাঁকুড়া, ২০.১০.২০২৪

[xviii] সাক্ষাৎকার। সোনা হাঁসদা, বয়স ২৭ বছর, পেশা- গৃহবধূ, গ্রাম- ধোবাসোল, ব্লক- রাইপুর, জেলা- বাঁকুড়া, ১৩.১০.২০২৪

সাক্ষাৎকার।

[xix] সাক্ষাৎকার। তুলসি সোরেন, বয়স ৩২ বছর, পেশা- গৃহবধূ, গ্রাম- মুকুন্দপুর, ব্লক- রাইপুর, জেলা- বাঁকুড়া, ১৫.১০.২০২৪

[xx] সাক্ষাৎকার। তদেব, ১৫.১০.২০২৪

[xxi] সাক্ষাৎকার। সনাতন বাস্কে, বয়স ৪২ বছর, পেশা- মৎস্যজীবী, গ্রাম- কামারদিহা, ব্লক- রাইপুর, জেলা- বাঁকুড়া, ১৫.১০.২০২৪

[xxii] https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-amendment-act-1992, Accessed 8th March, 2025.